কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি.. . . .

তসলিমা নাসরিন

ভাবনাটি মাথা থেকে ঝট করেই নামিয়েছেন গৌতম দত্ত। হাসঁফাঁস করছিলেন, অতপর একরাশ আশের সঙ্গে ভাবনাটিকে কিছুদিন বাস করিয়ে খাস জমিতে চাষ করিয়ে তবেই বন্ধুদের কাছে ফাঁস করলেন। এতে লাভ হল। বন্ধুরা মশকরা করে বন্ধুর পথ না দেখিয়ে সোজা সরলরেখা দেখিয়ে দিলেন, এতে আশকারা পেয়ে অমনি তিনি প্রকাণ্ড জাল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কবিতার অথৈ সাগরে। জাল দিয়ে মাছ ধরার মতো অনেকটা, জালে ধরা পড়ছে ছোট বড় পিচ্ছিল কবিতা। উফ, কাব্যগ্রন্থ না পড়ে, ইতিহাস না ঘেঁটে পশ্চিমের কালো কবিদের কবিতা সংকলন বের করার মানে নির্ঘাত পাঠক ঠকানো। পরে জেনেছি, না, পুরোটাই জাল অর্থাৎ নেট (ইন্টারনেট)-এর ওপর ভরসা করে নয়, বইও বেশ কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। কালো কবিতার আর ভালো কবিতার নেশায় পেয়েছিল বলেই সম্ভব হয়েছে। এই নেশা অনেক কালো কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কও তৈরি করে দিয়েছে। এর পর গৌতমের যে কাজটি অভিনব, তা হল বন্ধুদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া। কবি-বন্ধুরা কবিতা অনুবাদের দায়িত্ব নিয়ে গৌতমকে যত না ধন্য করেছেন, নিজেদের করেছেন তার চেয়ে বেশি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বর্ণবাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন মুখবন্ধে। সুনীল লিখেছেন, *শ্বেতাঙ্গরা ঘৃণার সঙ্গে নিগার শব্দটি উচ্চারণ করত, তাদের অনুসরণে আমরাও বলতাম নিগ্রো।* ব্যাপারটি এত সাদাকালো নয়। একটু তলিয়ে দেখলে দেখব, নিগ্রো লাতিন শব্দ। লাতিন থেকে জন্ম নেওয়া ইতালিয়ান, স্প্যানিস, পর্তুগিজ এবং ফরাসি ভাষায় শব্দটি আছে। এই শব্দের মানে কালো রং। কালো মানুষদের বলা হত নিগ্রো, সে ইংরেজিতে। নিগার শব্দটির উৎপত্তি কেউ বলে নিগ্রো শব্দটির দক্ষিণাঞ্চলীয় উচ্চারণ থেকে, কেউ বলে প্রাচীন মিশরীয় শব্দ NGR থেকে , যার অর্থ ঈশ্বর। নিগ্রো শব্দটি শব্দ হিসেবে অশ্লীল নয়, কালোরাও একসময় নিজেদের নিগ্রো বলতো। কিন্তু সাদারা যখন নিগ্রোদের ঘৃণা করতে শুরু করে, নিগ্রো নামটি উচ্চারণের মধ্যেই উৎকটভাবে তাদের ঘৃণা প্রকাশ হতে থাকে। শব্দটি এখন

একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ধীরে ধীরে বিবর্তনে এমন দাঁড়িয়েছে যে কাউকে হেয় করার জন্যই এটি ব্যবহার হয়। এক সাদাও আজকাল আরেক সাদাকে রাগ করে বেদম নিগ্রো বা নিগার বলে।

বাঙালির রক্তে বর্ণবাদ। এই বাঙালি সাদা কোনও খুনী দেখলে খুশিতে গদগদ হয়ে পেন্নাম করবে কিন্তু কালো কোনও পন্ডিত দেখলেও ফিরে তাকাবে না। দুশ বছর সাদার গোলামি করার পর মগজ মস্তিস্কে ঢুকে গেছে গোলামির স্বভাব। বাঙালির বর্ণবাদ নিজের জাতকেও ঘৃণা করিয়ে ছাড়ে। ত্বকের রঙ কালচে হলে আর রক্ষে নেই, বিশেষ করে সে যদি মেয়ে হয়। এই বাঙালি সাদা লোকের অনেক অপাঠ্য আবর্জনা পড়ে আহা আহা করেছে মুগ্ধতায়। এখনও করে। বেশির ভাগ বাঙালির কাছে সাহেবের বিষ্ঠাও বৈচিত্রময়। এহেন বাঙালির হাতে যদি তুলে দেওয়া যায় ক্রীতদাসের পুত্রকন্যা তস্যপুত্রকন্যার কবিতা, তবে নজর কাড়বে কেন! অবশ্য সমাদৃত হবে যাঁরা সত্যিকার শিল্পকে সম্মান করতে জানেন, তাঁদের কাছে , যাঁর শিল্পীর গায়ের রং দেখে শিল্প বিচার করেন না। যে মানুষেরা দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ধরে অত্যাচারিত হয়েছে, মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য জীবনভর সংগ্রাম করছে, সেই কালোদের কাহিনী শুনতে ভালো না লাগলেও তাদের কাহিনীর মূল্য অনেক। বইটিতে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা কেবল বর্ণবাদের বেদনার কথা লেখেথনি, জীবনের সবরকম অনুভবের কথাই লিখেছেন।

বইটি নিঃসন্দেহে অসাধারণ। কিন্তু কবিতা বাছাই আরও একটু ভালো হতে পারতো। পিংকি গরডন লেন, কাউন্টি কোলেন, জেমস ওয়েলডন জনসন, বা অ্যালিস ওয়াকারের মতো শক্তিমান কবিদের কবিতা বাদ দিয়ে টুপাক শাকুরের মতো র‍্যাপ গায়কের লেখা গান নেওয়া হয়েছে কেন, তা বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কারওর একাধিক কবিতা অনুবাদ করা হয়েছে, কারওর একটি। এর মানে কি এই যে যাদের বেশি কবিতা নেওয়া হয়েছে তারা ভালো কবি, আর যাদের কম কবিতা তারা তুলনায় খারাপ?

বইটির সম্পাদনায় আরও একটু মন দেওয়া উচিত ছিল। টুপাক শাকুরের মুত্যুর সালটি লেখা হয়নি। আর ওদিকে সুবোধ সরকার অনুবাদ করেছেন **Wise,Why's Y's** নামের বিখ্যাত বইয়ের লেখক লেরয় জোনস

ওরফে আমিরি বারাকার ***হুমফ*** নামের কবিতা। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ***হুমফ*** নামে আমিরি বারাকা কোনও কবিতা লেখেননি। তবে, **humph** শব্দটি বারাকার **Wise 1** কবিতায় আছে। শব্দটি বিস্ময়ের, সংকোচের বা স্বস্তির প্রকাশ। কিন্তু কবিতা যখন তুমি বাংলায় অনুবাদ করো, তখন তো এই প্রকাশেরও অনুবাদ প্রয়োজন। হুমফকে হুমফ রেখে, ইটস রেইনিং ক্যাটস এন্ড ডগস কে বৃষ্টি পড়ছে বেড়াল এবং কুকুর করে, হার্টবার্নকে হৃদয়-পোড়া লিখে দিয়ে, অর্থহীন আক্ষরিক অনুবাদ করা তো সত্যিকারের অনুবাদ নয়! কবিতাটির শুরুতে ছিল **'WHY'S (Nobody Knows The Trouble I Seen) Traditional.'** -- এই অংশটির অনুবাদ জানি না কি কারণে করা হয়নি। মূল কবিতার অংশ বাদ দেওয়া কেবল অনুচিত নয়, অন্যায়।

শব্দের যেমন যেমন অর্থ অভিধানে জোটে, তেমন তেমন বসিয়ে এমন সব বাক্য রচনা করেছেন কেউ কেউ যা বোধে গিয়ে কোনও তরঙ্গ তোলা তো দূরের কথা, বোধের ত্রীসামানা মাড়ায় না। মূল এবং অনুবাদের মধ্যে ব্যবধানের একটি দেওয়াল তৈরি হয়ে যায়। অনুবাদও সাহিত্য। কিন্তু এটিকে কজন আর সাহিত্য বলে মান্য করেছে! মীণাক্ষী দত্তের কথাই ধরা যাক। তিনি **ব্লুজ** নামে এলিজাবেথ আলেকজাণ্ডারের একটি কবিতা অনুবাদ করেছেন। এই কবিতায় তিনি ব্লুজ, কুকি, ফ্যাক্টরি আউটলেট, স্টকিং, কার্টসি এসবের বাংলা না করে ইংরেজি শব্দগুলোই রেখে দিয়েছেন। তাঁর বাংলারও কী দুর্দশা, curdy bellyর অনুবাদ করেছেন, *দইয়ের মতো পেট।* মীণাক্ষী আর এমন কী করেছেন, সব্বনাশ করেছেন প্রদীপচন্দ্র বসু। **Round About Midnight** কবিতার *sitting on the bed,/ with a jazz type chick/ Round about Midnight,* এর অনুবাদ করেছেন *জ্যাজের মতন মুখ করে/ বিছানায় বসে আছে,/ যেন প্রায় মধ্যরাত।* বিছানায় বসে আছে বুঝলাম, কিন্তু প্রদীপবাবু, কে বসে আছে বিছানায়?

শ্রী প্রদীপচন্দ্র যদি **chick** শব্দটির অর্থ জানার চেষ্টা করতেন, জানতেন যে **chick** বলতে ছোট পাখি, ছোট মুরগি, পেঙ্গুইনের বাচ্চা নানা কিছু বোঝায়, এবং স্ল্যাং হিসেবেও এটি খুব ব্যবহার হয়। অল্প বয়সী তরুণীদের **Chick**

বলা হয়। **Jazz Chick** নামের কবিতাটির বাংলা শিরোনাম ***জ্যাজ শিশু*** করে পুরো কবিতায় সেই **শিশুর** বুকের, নিতম্বের, শরীরের ঝংকারের বর্ণনা করেছেন তিনি। আরে বাবা প্রদীপচন্দ্র, তুমি তো **শিশু ধর্ষণের** উপক্রম করছো। চাইল্ড অ্যাবুউজ এর মামলায় কিন্তু ফেঁসে যাবে। *যেন প্রায় মধ্যরাত* কবিতার শেষ দুলাইন পড়ে তো আমাকে হতভম্ব বসে থাকতে হয়েছে। **Chick** শব্দের অর্থ জানো না, **Baby** শব্দটি কখন কখন কী অর্থে ব্যবহার হয়, তাও জানো না!! প্রেমিক প্রেমিকারা সোহাগ করে পরস্পরকে *বেবি* ডাকে গো! *Come on Baby, take off your clothes, / Round About Midnight* এর অনুবাদ করা হয়েছে, *চলে এসো **খুকি,** খুলে ফেলো পোশাক-আড়াল/এখন তো প্রায় মধ্যরাত।* **খুকি?** খুকিকে ডাকা হচ্ছে পোশাক খুলে ফেলতে!! এতো দেখছি ভয়ংকর পেডোফিলিক পদ্য!

যে ভাষা থেকে কবিতা অনুবাদ করতে হয়, সেই ভাষায় দখল না থাকলে হয় না। শুধু তাই নয়, ওই ভাষার বর্তমান রূপরসগন্ধ সম্পর্কেও ভালো জ্ঞান রাখতে হয়। মানুষের মুখ থেকে ভাষা শিখতে হয়, রাস্তাঘাটে, ট্রেনে বাসে, পাড়ায় বস্তিতে বেহিসেবী ঘুরে ফিরে ভাষা শিখতে হয়। কেবল বই পড়ে ভাষার সবকিছু শেখা যায় না, ভাষার অন্তরে ঢোকা যায় না।

অনুবাদ করতে গেলে, বিশেষ করে কবিতা অনুবাদ, ভাবানুবাদে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কবিতা তখন এত চমৎকার হয়ে ওঠে যে মনেই হয় না কবিতার কোনও অনুবাদ পড়ছি, ওরা নিজেরাই তখন এক একটি স্বতন্ত্র সুন্দর বাংলা কবিতা। মহুয়া চৌধুরীর *কাঁটা বণিকের ডানহাত* কবিতার কথা বলা যায়।

well, that's Pretty Boy Emeritus
alias leo the machine, great grandson
of Eddie the immune, a real ladies man (মূল কবিতা)

আর
ওই দেখো এককালীন ফুলবাবু
ওরফে লবকাত্তিক লিও, লৌহমানব
এডির পরপোতা. নামডাকের নাগর.. (অনুবাদ)

কিন্তু অনুবাদে পারদর্শি না হওয়াতে বইয়ের অনেক অনুবাদকই, যেহেতু অনেকেই কবি, শব্দ চয়নে দক্ষতা দেখিয়েছেন, কিন্তু বোধের মধ্যে গাঁথতে পারেননি দীর্ঘদীর্ঘ কাল অত্যাচারিত কালো মানুষের অনুভব। ঠিক সেই চোখে তাঁরা অনেকেই দেখতে পারেননি পৃথিবীকে, যে চোখে কালো মানুষেরা দেখে। কেবল অক্ষরের অনুবাদ হলেই কি যথেষ্ট! দৃষ্টিরও অনুবাদ দরকার।

এই যে ভাবানুবাদের কথা বলছি, বইটিতে আবার কোথাও কোথাও ভাবানুবাদের আতিশয্য এত বেশি যে *আসল কবিতা* কর্পুরের মতো মিলিয়ে যায় হাওয়ায়, থাকে শুধু বাদ প্রতিবাদহীন ছাঁদহীন স্বাদহীন অনুবাদ। অবশ্য সবসময় নয়, আসলের চেয়ে নকলটিও মাঝে মাঝে দেখা যায় রূপে গুণে অনন্যা। মূল আর অনুবাদের মধ্যে বক্তব্যের মিল থাকার পাশাপাশি লেখার ধরণের মিল থাকা, ছন্দের মিল থাকা -- যত বেশি হবে, ততই অনুবাদের সার্থকতা। বুর্গহার্ড ডু বয়এর **The song of the smoke** (ধোঁয়ার গান) কবিতার অনুবাদে বক্তব্য, ছন্দ, অন্তমিল সবই রক্ষা করেছেন গৌতম দত্ত।

আমিই তোমার ধোঁয়ার রাজা,/আমিই তোমার কালো মানুষ।/আমি দুলি ওই আকাশ দোলা/আমি নাড়া দিই দুনিয়া জোড়া/আমি ধুকপুক সুতোর কলে,/আমি যে সত্তা খেটেই চলে,/আমি ছোট ঢেউ নদীর জলে।

অনুবাদ পরিশ্রমের কাজ। মূল কবিতা লিখতে যত না পরিশ্রম হয়, অনেক অনেক সময় তার চেয়ে বেশি হয় অনুবাদের কাজে। ফরাসি লেখক জর্জ পেরেক নানারকম কায়দা করতেন উপন্যাস লিখতে গিয়ে। একবার **La Disparition** নামে একটি বিশাল বই লিখলেন স্বরবর্ণের e (ই) বর্ণটি বাদ দিয়ে। এই **ই** বর্ণ ফরাসি ভাষায় খুব প্রায়োজনীয় একটি বর্ণ, প্রায় প্রতি মুহূর্তে এটির প্রয়োজন পড়ে। জর্জ পেরেকের যাদু তো দেখা হল। এরপর এল আরও বড় যাদু। ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে বইটির, নাম -- **A Void.** পুরো বইয়ে (e) ই -এর চিহ্ন নেই। অনুবাদকের নাম গিলবার্ট অ্যাডেয়ার। আহ, তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি গো।

আমি আমার মৃত্যুর পর স্বাধীনতা চাই না বইটি ইউসেফ কমুনইয়াক, পুলিৎজার পাওয়া কবি, ১০০০ কপি কিনে পশ্চিমবঙ্গের ১০০০ লাইব্রেরিতে দিয়েছেন। পাঠকের জন্য এ এক মস্ত সুবিধে। পাঠক জানবে কালো মানুষের সংগ্রামের কথা । বিভিন্ন আন্দোলনে, রেনেসাঁসে, প্রতিবাদে

প্রতিশোধে তাদের রুখে ওঠার কথা। কিন্তু পাঠক কি জানবে কালো মেয়েরা কেবল যে সাদা দ্বারাই নির্যাতিত হয়নি, কালো পুরুষ দ্বারাও অহোনিশি নির্যাতিত হয়েছে? ঘরে বাইরের এই নির্যাতন সম্পর্কে মেয়েদের অনুভবগুলো, তাদের কষ্ট যন্ত্রণা, ক্ষোভ বিক্ষোভগুলো সবই দেখতে চাই ছুঁয়ে ছুঁয়ে, ঘ্রাণ শুঁকে, হৃদয়ে হৃদয় রেখে। যারা কবি, বড় কবি, কিন্তু শরীরে পুরুষাঙ্গের অভাব আছে বলে নাম ওঠে না বিখ্যাতদের তালিকায়, তাদের কবিতা স্যাঁতস্যাঁতে তোশকের তল থেকে আলোয় আনুন ইউসেফ কমুনইয়াক। কবিতা পড়তে চাই সেই মেয়েদের। লোকে যখন তাদের *কালো* বলে ডাকে, ভালোবেসে আমি তাদের ***কৃষ্ণকলি*** নামে ডাকতে চাই ।